গৌতম বুদ্ধ

গৌরী মিত্র

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

নিবেদন

ঈশ্বর, দেবদেবীতে বিশ্বাস, ভক্তিকে নয় — সততা, পবিত্রতা, নীতিপরণতা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গুণগুলিই বুদ্ধধর্মে ধর্মের লক্ষণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। আর যে মানুষ এই গুণগুলির অধিকারী তাঁকে বলা হয়েছে ধার্মিক।

পঞ্চশীল, দশশীল, অষ্টাঙ্গমার্গের কথা আছে বুদ্ধধর্মে। সবের উদ্দেশ্য নীতিপালন। মানুষের জীবনে নীতিবোধের উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছিলেন বুদ্ধ। তিনি বুঝেছিলেন — নীতিবোধ জাগলে মানুষের মন থেকে দূর হয়ে যাবে সব স্বার্থান্ধ চিন্তা। ঐক্যবোধ আর মৈত্রীভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ অপরের মঙ্গলচিন্তা করবে। স্বার্থচিন্তাই কি মানুষকে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে না?

বুদ্ধধর্মে আছে নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তির কথা। এই মুক্তি মানে স্বার্থচিন্তা জড়িত ক্ষুদ্র জীবন থেকে মুক্তি। এই মুক্তি ঘটলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন বলে ভাবে মানুষ। ব্রহ্মাণ্ডের সকলের মঙ্গলচিন্তা করে সে।

বুদ্ধের পথ কল্যাণের পথ—এ কথা বলেছেন বিশ্বের সব শ্রেষ্ঠ মানুষরাই। কোনো বিশেষ যুগের জন্য নয়, সব কালের সব মানুষের জন্য এ পথ কল্যাণকর। মানুষ আজ এ পথ থেকে সরে এসেছে। অকল্যাণের পথ ধরে চলেছে ধ্বংসের মুখে। স্বার্থন্বেষী হয়ে মানুষ মেতে উঠেছে অমানবিকভাবে। মেতে উঠেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে।

বুদ্ধপথেই নিতে হবে আমাদের আশ্রয়। বুদ্ধপথকে চিনে নিতে, বুঝে নিতে হলে আমাদের জানতে হবে, পড়তে হবে পথ-প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের মহাজীবনের কাহিনি। জীবনকাহিনি পড়লে আমরা জানতে পারব — কেন গৌতম বুদ্ধ ইতিহাসে এক মহান লোকশিক্ষক রূপে চিহ্নিত হয়েছেন আর তার প্রবর্তিত পথ কেন এক কল্যাণকর পথ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

সূচিপত্র

- ❖ বুদ্ধকালীন ও তাঁর পূর্বকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৯
- ❖ বংশ পরিচয় ১৪
- ❖ মায়ের স্বপ্নদর্শন ১৬
- ❖ জন্মগ্রহণ ১৭
- ❖ জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ-গণনা ১৮
- ❖ ঋষি কালদেবলের ভবিষ্যৎ-বাণী ২০
- ❖ শৈশবকাল ২২
- ❖ শিক্ষাজীবন ২৪
- ❖ বিবাহ ২৬
- ❖ মহাভিনিষ্ক্রমণ ২৮
- ❖ রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৩১
- ❖ অরাঢ় ও রুদ্রক মুনির কাছে শিষ্যত্বগ্রহণ ৩৩
- ❖ ছয় বছর ধরে কঠোর তপস্যা ৩৪
- ❖ সুজাতার পায়সান্ন নৈবেদ্য ৩৭
- ❖ বোধিলাভ ৩৯

❖ ধর্মচক্র প্রবর্তন ৪১

❖ ধর্মপ্রচার শুরু ৪৪

❖ রাজা বিম্বিসারের দীক্ষা ৪৬

❖ শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের দীক্ষালাভ ৪৮

❖ সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে জয়ী ৪৯

❖ জন্মস্থান কপিলাবস্তুতে আগমন ৫১

❖ উপাসক অনাথপিণ্ডদ ৫৩

❖ উপাসিকা বিশাখা ৫৬

❖ জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করে না ৫৮

❖ ভিক্ষুণী সংঘের মহীয়সী নারীরা ৬০

❖ দৃষ্টি ছিল বহুধা প্রসারিত ৬২

❖ দস্যু অঙ্গুলিমালের কথা ৬৫

❖ একান্ত শিষ্য ভিক্ষু আনন্দ ৬৭

❖ জীবকের কথা ৬৯

❖ অজাতশত্রু আর দেবদত্ত ৭২

❖ শ্রীবৃদ্ধিকারী সাত গুণের কথা ৭৫

❖ আম্রপালীর ধর্মলাভ ৭৬

❖ আয়ুসংস্কার বিসর্জন ৭৯

❖ মহাপরিনির্বাণ ৮২

❖ প্রথম বৌদ্ধসংগীতি ৮৭
❖ বৌদ্ধধর্মের প্রচারে সম্রাটের ভূমিকা ৯০
❖ সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ৯৩
❖ জীবনপঞ্জী ৯৬

বুদ্ধকালীন ও তার পূর্বকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

গৌতম বুদ্ধের জীবন ও তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। গৌতম বুদ্ধ মুখে মুখে বলে তার ধর্মবাণী শোনাতেন। বুদ্ধ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন—এটি প্রথম জানা যায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৪-২৩৭ অব্দ) শিলালিপি থেকে। এই লিপিতে আছে বুদ্ধের উপদেশ, জীবনী নয়। বুদ্ধের জীবন, বাণী আর তাঁর সমকালকে জানার জন্য নির্ভর করতে হয় পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর। দুটিই বহুবিধ তথ্যের উৎস। তবে জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ—বুদ্ধের যে সুদীর্ঘ জীবন তার প্রামাণ্য ইতিহাস একত্রে কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না—না পালিতে, না সংস্কৃতে।

'জাতক নিদান কথা'—এটি পালিভাষায় রচিত এক গ্রন্থ। বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনার কথা এতে বিবৃত হয়েছে। মহাবগ্গ—

এটিও পালি ভাষায় লেখা। 'সুত্তপিটক', 'জিনচরিত', 'জিনালংকার' প্রভৃতি গ্রন্থও পালিতে রচিত। সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক গ্রন্থের মধ্যে 'বুদ্ধচরিত কাব্য', 'ললিত বিস্তর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্যার এডুইন আরনল্ডের "Light of Asia" শীর্ষক ইংরাজি গ্রন্থটি সংস্কৃতে লেখা বুদ্ধজীবনী কাব্য ললিত বিস্তরের ওপর ভিত্তি করে লেখা। ইংরাজি, লাতিন, রুশ, ইটালি, ফরাসি, চিনা, জাপানি.....বহু ভাষায় বুদ্ধচরিত কাহিনি লেখা হয়েছে। হিন্দি, মারাঠা, মালয়ালম, ভারতীয় প্রায় সব ভাষাতেই বুদ্ধজীবনী রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বহু রথী মহারথী বুদ্ধের জীবন নিয়ে রচনা করেছেন অনুবাদ সাহিত্য, প্রবন্ধ, নাটক, কাব্যগাথা, উপন্যাস, গল্প।

পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষায় লেখা সব রচনাই স্বকীয়তা গুণে সমৃদ্ধ। আর সবই রচিত হয়েছে পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থগুলির ওপর ভিত্তি করে। মূল গ্রন্থগুলিকে প্রামাণ্য বলেই স্বীকার করেছেন ইতিহাস গবেষকরা।

সাহিত্য উপাদান শুধু নয়, বৌদ্ধ ভাস্কর্যের ওপর ভিত্তি করেও বুদ্ধজীবনী রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তি আছে বিভিন্ন স্থানে। মূর্তির প্রচলন হওয়ার আগে বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র, পদচিহ্ন ইত্যাদি দ্বারা বুদ্ধকে প্রকাশিত করা হত।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (আনুমানিক ৫৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)। তিনি জন্মেছিলেন হিমালয়ের সানুদেশে কপিলাবস্তু নামক স্থানে। তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছিল কোশল, মগধ, বৃজি, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে। অর্থাৎ বর্তমানের উত্তরপ্রদেশ, বিহার রাজ্য জুড়ে। বুদ্ধের জন্মকালে ও

তার আগে এ সব জায়গার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কেমন ছিল তা না জানা থাকলে বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা সম্ভবপর নয়।

বুদ্ধের জন্মের আগে থেকেই এ সব জায়গায় রাজনীতি, অর্থনীতি এককথায় সমাজের পটভূমিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। প্রথম নগরায়ণ প্রাগার্যকালে হরপ্পায়, মহেঞ্জোদারোতে দেখা গিয়েছিল। সাম্রাজ্য- বিস্তারী যুদ্ধ ঘটেছিল কুরুক্ষেত্রে। গান্ধার, মদ্র, পাঞ্চাল থেকে রাজক্ষমতা সরে গিয়েছিল এ সময় কোশল, মগধ প্রভৃতি স্থানে। অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের পশ্চিম থেকে সরে যাচ্ছিল ক্রমশই পূর্বে। বুদ্ধের আবির্ভাবকালে উত্তর ভারতে ছিল ষোলোটি মহাজনপদ অর্থাৎ রাজ্য। বৃজি, অঙ্গ, অবন্তী, বৎস, মল্ল প্রভৃতির মধ্যে কোশল ও মগধের প্রতিপত্তি ছিল বেশী। ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বলে চিহ্নিত বিম্বিসারের রাজত্ব ছিল মগধে। কোশলের সম্রাট ছিলেন প্রসেনজিৎ। কপিলবস্তু ছিল কোশলের অধীনস্থ এক গণরাজ্যের রাজধানী। গণরাজ্যের অধিপতি শুদ্ধোদন এক রাজন্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তিনি রাজা বলেই চিহ্নিত হয়েছিলেন।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায় এ সময় অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দ্বিতীয় নগরায়ণ শুরু হয়েছিল। বন কেটে বসতি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল লৌহাস্ত্র। কাশী, বারানসীর সঙ্গে কৌশাম্বী, বৈশালী, সাকেত, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী—এই সব নামের বড়ো বড়ো শহরের নাম এ সময়ে শোনা যায়। নগরকেন্দ্রিকতাই মানুষের জীবনে এনেছিল পরিবর্তন। কৃষিজীবিকা, বৃত্তিজীবিকার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছিল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাধান্য। ভূমি, পাণ্ডিত্য

নয় ক্ষমতার উৎস হয়ে উঠতে শুরু করেছিল ধন। শ্রেষ্ঠী, গণপতি ইত্যাদি বণিকদের তখন সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল সমাজে। মুদ্রা-নির্ভর অর্থনীতি শুরু হয়েছিল এ সময়ে। শিক্ষা, সংস্কৃতির পীঠস্থান তখন তক্ষশিলা (পাকিস্তানের ইসলামাবাদের কাছে বর্তমান অবস্থান)।

সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির প্রতি বিরূপ মনোভাব এ সময়ে দেখা গিয়েছিল। সমাজের মৈত্রী, শান্তিকামী মানুষেরা একটি বিশেষ জাতি, পরিবার নির্ভর শাসনতন্ত্র নয়, চাইছিলেন অঞ্চলভিত্তিক এমন শাসনতন্ত্র যেখানে অভিজাত, সৎ, বিচক্ষণ, দরদি কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির হাতে থাকবে ক্ষমতার ভার। কপিলবস্তু, বৈশালী—এই সব গণরাজ্যের কথা এই সময়ে শোনা গিয়েছিল। তাই রাজতন্ত্র থেকে সাধারণতন্ত্রে যে উত্তরণপর্ব—তার সূচনা হয়েছিল এ সময়েই। মানুষের মধ্যে গণচেতনা জেগে উঠতে শুরু করেছিল।

হিন্দুধর্মের উৎস প্রাচীন গ্রন্থ বেদ। এই গ্রন্থে নেই জাতি-বিচার, বর্ণবৈষম্যের কথা। ঈশ্বর, জগৎ, আত্মা, পরকাল—আধ্যাত্মিক সব তত্ত্ব সম্বন্ধে বেদে আছে যে সব আপ্তবাক্য অর্থাৎ অভ্রান্ত বাক্য তার অপব্যাখ্যা করে এই সময় কূট-কৌশলী ব্রাহ্মণরা সমাজের অর্বাচীন মানুষদের বশে আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বেদপাঠ, বেদকথা শোনার অধিকার শুধু ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের ছিল। বেদের সত্যবাক্যের মর্মার্থ তাই সেকালকার বহু মানুষের কাছে ছিল অজানা। বৈদিক আখ্যা দিয়ে ব্রাহ্মণরা শুরু করেছিলেন অপচয়ী যাগযজ্ঞ, পশুহত্যা। যজ্ঞের ব্যয় তোলা হত প্রজাদের ওপর কর চাপিয়ে দিয়ে। সাধারণ মানুষ জানত জাগতিক সব

কর্ম সম্পন্ন হয় দৈবের কৃপায়। দৈব অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্ব কর্মের নিয়ন্তা। বুদ্ধই মানুষকে কর্মের মূল্য বুঝতে শিখিয়েছিলেন। শুভবুদ্ধিতে সম্পন্ন কর্মের দ্বারাই মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, দৈবের দ্বারা নয়। মানুষের মনে দৈব বা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা ছিল, যে সব কুসংস্কার ছিল তা মনস্তত্ত্ববিদ বুদ্ধ দূর করতে চেয়েছিলেন জাতকের কাহিনির মতো সহজ উপাখ্যান শুনিয়ে। সব মানুষ যাতে ধর্মের তত্ত্বকে বুঝতে পারে সে জন্যই বুদ্ধ ধর্মকথা শোনাতেন দেবভাষা বা সংস্কৃতে নয়, পালি ভাষায়। তখনকার প্রচলিত ভাষা ছিল পালি। আগে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হত সংস্কৃতে, আর তা গুরু-শিষ্যের গোপন সংলাপের মধ্যে সীমায়িত থাকত। ধর্মশাস্ত্র পাঠ, ধর্মকথা শোনা—এ সব হত অরণ্য-পরিবেশে। ধর্মের পরিবেশ ছিল আরণ্যক। ঋষি-আশ্রমে গুরু-শিষ্যের মধ্যে আর বাণপ্রস্থী মানুষ ও ঋষিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ধর্ম নামের বিষয়টি। যাজ্ঞবল্ক্য, বেদব্যাস, বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিবরেরা রাজসভায় এসে শোনাতেন পুনর্জন্ম, আত্মা, ব্রহ্মের কথা। সে অমৃত কথা সমাজের সকলের সামনে উচ্চারিত হত না। বুদ্ধের ধর্ম-পরিবেশ ছিল নাগরিক। ধর্মকে সর্বব্যাপী, সর্বত্রগামী করার জন্য বুদ্ধই প্রথম ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মকে প্রেম, সাম্য, করুণায় সমৃদ্ধ করেছিলেন তিনি। বুদ্ধ-সংঘে সবাই স্থান পেয়েছিলেন—নটী, সম্রাট, মহিষী, দাস, দাসী, ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, ধনী, জরাব্যাধিগ্রস্ত মানুষও। বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের প্রভাব দেখা গিয়েছিল রাজনীতি, অর্থনীতিতে। এ ধর্ম তখনকার সমাজের প্রতিটি মানুষের মনে জাগিয়েছিল প্রেম, সাম্যবোধ, সাহস, নিরাপত্তাবোধ। নিজেকে সমাজের একজন বলে ভাবতে শিখেছিল মানুষ।